সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী রহ.-এর
মালফুযাত ও বয়ান সংকলন

মাজালিসে যাকারিয়া রহ.

সংকলন
মাওলানা তকিয়ুদ্দীন নদভী

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

বয়ান ও মালফুযাত মাজালিসে যাকারিয়া রহ.
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪২ / মে ২০২১
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব
ISBN : 978-984-95227-5-1
মূল্য : ৳ ৪০০ (চার শত টাকা) USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইয়াহিয়া কান্ধলভি সাহারানপুরী (২ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮—২৪ মে ১৯৮২) ছিলেন একজন হাদীস-বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক এবং আধ্যাত্মিক রাহাবার। তিনি ১৮৯৮ সালে কান্ধলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া। গাঙ্গোহ নামক স্থানে তিনি তার পিতার মাদরাসায় দশ বছর পাঠগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে তিনি মাজাহির উলুম শাহারানপুর মাদরাসায় শিক্ষালাভের জন্য আসেন। এই মাদরাসা দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে সম্পর্কিত ছিল। তিনি তার পিতা ও মাওলানা খলিল আহমেদ সাহারানপুরীর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৫ সালে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি এখানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তার চাচা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভি ছিলেন সংস্কারমূলক আন্দোলন তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি *ফাজায়েলে আমল* নামক গ্রন্থের লেখক। এটি উর্দুতে লিখিত হলেও পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এছাড়া তিনি আরও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বক্ষমাণ গ্রন্থটি যাকারিয়া রহ.-এর রচনা নয়। তবে বিভিন্ন মজলিসে তারই বয়ানের সংকলন। তার একান্ত শিষ্য মাওলানা তকিয়ুদ্দীন নদভী মাযাহেরী এ বরকতময় কাজটি করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আর এটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন এদেশেরই একজন খ্যাতিমান লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক সাহেব। আল্লাহ তাআলা তাদের এই কাজের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উল্লেখ্য বইট প্রথমে *মাকতাবাতুত তাকী* থেকে প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এটি এখন *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এ অসাধারণ বইটি বাংলা সাহিত্যে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন বলেই তা আবার পাঠকদের জন্য সহজলভ্য হতে যাচ্ছে। আশা করা যায়, এর মধ্যে লুকায়িত জ্ঞান ও বরকতলাভে সবাই ধন্য হবেন, দ্বীনের পথে অগ্রসর হতে এটিকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে—তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। মহান আল্লাহ তাআলা এই বইটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন, সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

৩ যিলহজ ১৪৪২
১৪ জুলাই ২০২১

কিছু কথা

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.-এর সূর্যালোকিত ব্যক্তিত্ব কোনো ধরনের পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তা'লীম, তাযকিয়া, তালীফাত ও তাবলীগের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে তাঁর অসামান্য খেদমত ব্যাপৃত। তাঁর বিভিন্ন রচনা, বিশেষ করে ফাযায়েলে আমাল, হিকায়াতে সাহাবা, আপবীতি-এর মাঝে সমকালীন উলামায়ে কেরাম ও আল্লাহভোলা নেককারগণের ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলী ও বিবরণের প্রচুর সমাহার উঠে এসেছে। আর বিশ্ববিখ্যাত হাদিস বিশারদ সুফয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ. বলতেন,

عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

নেককারদের আলোচনা ও স্মৃতিচারণের সময় আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়।

শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর এক লেখায় লিখেছেন, 'আল্লাহর মকবূল বান্দাগণের, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণের, দ্বীন ও ইলমের মুজতাহিদবৃন্দের, কামিল আসাতিযায়ে কেরামের, মুজাদ্দিদ ও সমাজ সংস্কারকদের, বড় বড় লেখক ও গবেষকদের, ত্যাগ-তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী সংগ্রামী তাপসীদের, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী আরেফদের জীবনচরিত, স্মৃতিকথা বা পরিচিতিমূলক গ্রন্থাবলি যেই পরিমাণ উপকার বয়ে আনে এবং যেই পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে; আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে কুরআন ও হাদীসের পর সেই পরিমাণ প্রভাব বিস্তারকারী বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনকারী দ্বিতীয় কোনো রচনা বা প্রতিপাদ্য নেই।'

হারদুঈর হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ. বলতেন, 'উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন ও সমাজ সংস্কারকদের জীবনবৃত্তান্ত, নানা অবস্থা ও তাঁদের স্মৃতিকথাগুলো সংরক্ষণ ও প্রচার করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাঁদের পূতপবিত্র জীবনের বৃত্তান্তগুলো অন্যদের হিদায়াত ও তরবিয়ত, আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে অমূল্য নির্দেশনার ভূমিকা রাখে। এজন্য সেই সুখপাঠ্য আলোচনাগুলো সর্বযুগেই ব্যাপকাকারে সমাদৃত হয়ে আসছে।'

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর বিভিন্ন মালফুযাত সঙ্কলিত হয়েছে। মুক্তোর চেয়ে দামী সেই অমিয় বাণীগুলো হযরত বিশেষত ১৩৮৭, ৮৮ ও ৮৯ হিজরীর রমাযানের তাঁর মজলিসে ব্যক্ত করেছেন। হযরতের একান্ত ছাত্র ও বাইআতাবদ্ধ শিষ্য মাওলানা তকিয়ুদ্দীন নদভী মাযাহেরী মলাটাবদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে এই অনবদ্য কর্মের উত্তম প্রতিদান দিন।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ২০০৩-২০০৫ পর্যন্ত দীর্ঘ তিনটি বছর দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াশুনা করার তাওফীক দিয়েছেন। সেই সূত্রে মাযাহিরুল উলূম ওয়াকফ ও জাদীদের উভয় প্রতিষ্ঠানে একাধিকবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। হযরতের স্মৃতিধন্য মাকতাবায়ে ইয়াহইয়াঈ, খানকাহ ও মাদরাসা যিয়ারত করেছি। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা ইউনুস সাহেবের হাদীসে মুসালসালাতের দরসে বসতে পেরেছি। তখন থেকে হযরত কান্ধলভী রহ.-এর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর যখন কর্মজীবনে হাদীসের খেদমতের সুযোগ লাভ করি, তখন অধ্যয়নের ধারাবাহিকতায় যতবারই বযলুল মাজহুদ ও আওজাযুল মাসালিক মুতালা'আ করেছি, হযরতের প্রতি সেই প্রেম ও ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছি।

ফলে এই মালফুযাতগ্রন্থটি হাতে পেয়ে অনুবাদের লোভ সংবরণ করতে পারিনি। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য হযরতের স্বর্ণখচিত বাণীগুলো অনূদিত আকারে পেশ করার চেষ্টা করি। নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করার জন্য সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা *মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর প্রতি রইল অফুরন্ত ভালোবাসা। আল্লাহ তাদের আরও বরকত দান করেন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল ফারুক
নন্দিপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রাককথা ১৭
শায়খের মা'মূলাত ও সময়সূচি ২৫

প্রথম মজলিস
মুবারক মাসের কাজগুলোর ওপর গভীর উপনিবেশ ৩৩
পাঞ্জাবের জনৈক পীর সাহেবের ঘটনা ৩৫
রমাযান মাসে হযরতুল আকদাসের তিলাওয়াতের মামূল ৩৬
রমাযান কি জ্বরের মতো আসে? ৩৭

দ্বিতীয় মজলিস
হযরতুল আকদাসের প্রথম হজের সফর ৩৯
মাওলানা মুহিব্বুদ্দীন সাহেবের মন্তব্য ৪১
মাওলানা মুহিব্বুদ্দীন সাহেবের একটি কাশফ ৪২
মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে বিপদজনক সফর ৪৩
মদীনায় তিন দিনের পরিবর্তে চল্লিশ দিন অবস্থান ৪৫
রওযা পাকে দরখাস্ত উপস্থাপন ও ফেরার গায়বি ব্যবস্থা ৪৫
একটি ইসতিফতা ৪৭
হযরত সাহারানপূরী রহ.-এর নামায ৪৮
৪৫ হিজরীতে হযরত রায়পুরীর প্রথম হজের একটি ঘটনা ৪৮
হাজীদের বৈষয়িক উপহার আনা ৪৯
হিজাযে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের একটি চিঠি ৫১

তৃতীয় মজলিস
হযরত রায়পুরী রহ.-এর একটি মুজাহাদা ৫২
চাচাজানের মুজাহাদাহ ৫৩
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের মুজাহাদাহ ৫৪
তাকওয়ার সংজ্ঞা ৫৫
একজন গ্রাম্য মুবাল্লিগের ঘটনা ৫৮

জনৈক বুযুর্গের মুজাহাদাহ ৫৯
সূফী আবদুর রবের ঘটনা ৬০
মেহমানদের উসীলায় আল্লাহ আহার দেন ৬২

চতুর্থ মজলিস
বুযুর্গদের জীবনের প্রথমাংশের দিকে যে তাকাবে সে সফল ৬৩
শাহ আবদুর রহমান সাহারানপুরীর ঘটনা ৬৫
আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার সহজ পদ্ধতি ৬৫
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির অন্বেষা ও ইখলাসের বরকত ৬৬
প্রতিটি নেকীই সদকা ৭০
'তাসাওউফ' কী? ৭১

পঞ্চম মজলিস
একটি জরুরী সতর্ক বার্তা ৭৭
মাদরাসা পৃষ্ঠপোষকতা চাট্টিখানি বিষয় নয় ৭৭
মাদরাসার বিভিন্ন লেনদেনে আকাবিরদের সতর্কতা ৭৮
মাদরাসায় বিলাসী উপকরণ ব্যবহারে বিরোধিতা ৮১
বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেয়ার বিরোধিতা ৮১
সরলতা ৮২

ষষ্ঠ মজলিস
সব বিষয়েই আমার অনুসরণ করবে না ৮৩
গ্রন্থস্বত্ত্ব ৮৪
অবগত না হয়ে মাসআলায় নিজস্ব অভিমত দেয়া বিভ্রান্তিকর ৮৪
বিপদাপদে সবরে জামীল ৮৫
নামাযে লোকমার মজার ঘটনা ৮৭
একটি ফারসী কবিতার ব্যাখ্যা ৮৭
আমল, তাবিজ ও তদবির ৮৯

সপ্তম মজলিস
হযরত সাহারানপুরী রহ.-এর হাতে বাইআত ৯০
সময়ের মূল্য ৯২

অষ্টম মজলিস
হযরত মাদানী ও হযরত রায়পুরী রহ.-এর অনুপম শিষ্টাচার ৯৩

নবম মজলিস
রমাযানে স্বল্প আহারে শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না ৯৭
প্রীতিময় সমালোচনা মন্দ লাগে না ৯৮
মাদরাসার ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি আমার ঘৃণা ৯৯
আল্লাহর সামনে যে মাথা নত করবে ১০২

দশম মজলিস
ইখলাসপ্রসূত সমালোচনা অবশ্যই প্রশংসনীয় ১০৪

এগারোতম মজলিস
মৌনতার মজলিস ১০৭
আল্লাহর দয়ার শোকর আদায় ১০৭

বারোতম মজলিস
তুমি তোমার ওপর অন্যের অধিকার আদায় করো ১০৮
চারটি হাদীস মেনে চললে দ্বীনের ওপর আমল হয়ে যায় ১১০

তেরোতম মজলিস
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১১৪

চৌদ্দতম মজলিস
আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশনার মাঝেই দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ ১১৭
বাইআত কাকে বলে? ১২০
ইজাযতের দায়িত্ববোধ ১২০
রমাযানে হযরত মাদানী রহ.-এর সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ ১২২

পনেরোতম মজলিস
শত্রুতা ও বন্ধুত্বর মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা ১২৩
'তামীরে হায়াত'-এর একটি প্রবন্ধ ১২৩

ষোলোতম মজলিস
মুজাহাদা ১২৪
মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ১২৪
রাতের খাবার ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা ১২৫
রমাযানের বিপরীত রূপ ১২৫

কান্ধলার ইফতার ও সেহরীর পদ্ধতি ১২৬
সময়সূচির নিয়মানুবর্তিতা ১২৬
মুরিদের তলবই আসল ১২৬
ওযু সহকারে পাঠদান ১২৮
হযরত সাহারানপুরী রহ.-এর সম্মুখে পান বর্জন ১২৯
ছাত্রদের মজলিস ১৩০

সতেরোতম মজলিস
আল্লাহর নাম গাফলতির সঙ্গে নেয়া হলেও প্রভাব করে ১৩১
নিসবত চার প্রকার ১৩২
শিষ্য কখনো কখনো গুরুকেও ছাড়িয়ে যায় ১৪১
তাবলীগের জনৈক সদস্যের স্বপ্ন ১৪২

আঠারোতম মজলিস
সব সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয় ১৪৩
থানাভবনে কুরআন শোনার অনুরোধ ১৪৪
মদীনা মুনাওয়ারায় তাজবীদ শুরু করার ঘটনা ১৪৪

উনিশতম মজলিস
খানকাহগুলোর দূরবস্থার ওপর আফসোস প্রকাশ ১৪৬
এ বছর ও বিগত বছরের রমাযানের মাঝে তুলনা ১৪৮
নিভৃতের কান্না ১৪৯
মর্দে মুমিন মৃত্যুকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে ১৪৯

বিশতম মজলিস
যে যাই বলুক, তুমি আপন কাজে মগ্ন থাকো ১৫১
দীর্ঘ পোশাকের সঙ্গে শায়খিয়তের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ১৫৩
নিজের শায়খের নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হওয়া দুর্ভাগ্যজনক ১৫৩
বড় রায়পুরী হযরত সম্পর্কে হযরত থানভী রহ.-এর অভিমত ১৫৩

একুশতম মজলিস
উদ্দীপনা থাকলে যে কোনো কাজই সহজ ১৫৪
সামা' (গীতের আসর)-উরস ১৫৪
যাচাই না করে বিধান আরোপ করা অনুচিত ১৫৭
'ফাযায়েলে দরুদ' কিতাবের একটি ঘটনার ওপর

হযরতের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ১৫৮

বাইশতম মজলিস

যিকির ও মুজাহাদাকারীদের জন্য দুটি কিতাব ১৫৯
মাকসাদ সহকারে এখানে এলে খুশি হই ১৫৯
মাদুরের ওপর বসাকে প্রাধান্যদান ১৬০
একাগ্রতায় আবিষ্ট রমাযান ১৬১
দারে জাদীদের মসজিদে ইতিকাফের সূচনা ১৬৩
শয়তান কখনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে অগুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত করে দেয় ১৬৪

তেইশতম মজলিস

দুআর বিভিন্ন স্তর ১৬৫
জনৈক ক্যামিস্ট্রিবিদের কাহিনী ১৬৭

চব্বিশতম মজলিস

আলীগড় থেকে একদল চিকিৎসকের আগমন ১৭০
একটি সতর্কবার্তা ১৭১
কাজ করতে হবে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে ১৭২
এখানকার পরিবেশ আমার অবস্থানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ১৭৩
এক সত্তার মাঝে তিনটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ১৭৪
সময়-সূচি নির্ধারণ ১৭৫

পঁচিশতম মজলিস

ঝনঝানার সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ১৭৬

ছাব্বিশতম মজলিস

আবেগ অবশ্যই যথোপযুক্ত স্থানে, প্রয়োজন অনুপাতে হওয়া দরকার; নয়তো তা হিতে বিপরীত হয়ে যায় ১৭৭
মৌসুমী ফল মৌসুম চলাকালে ক্ষতিকারক নয় ১৭৯
মৃত্যুর মুরাকাবা ১৭৯

সাতাশতম মজলিস

'আসবাব' অবলম্বন করা 'তাওয়াক্কুল'-এর পরিপন্থী নয় ১৮১
ব্যবসা ও সামাজিক জীবনে লিপ্ত থেকেও ওলী হওয়া যায় ১৮৩

আদবের সঙ্গে যিকির আদায় করা হলে মন্দ বিষয়গুলো দূরভিত হবে ১৮৪

আঠাশতম মজলিস

সাহারানপুরের দ্বীনদারী ১৮৫
হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ঈদের নামাযে গমন ১৮৬
শাহ ইয়াকুব মুজাদ্দেদী ভুপালী রহ.-এর সাহারানপুরে শুভাগমন ১৮৭
মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সঙ্গে সাক্ষাত ১৯২

উনত্রিশতম মজলিস

এখানকার প্রভাব পরবর্তী সময়ে ধরে রাখার উপায় ১৯৩
আমি ইজাযত-ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তিকে ইজাযত দিই না ১৯৪
একটি প্রবাদবচনের ব্যাখ্যা ১৯৪
দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ব্যক্তির কাছে দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে আসে ১৯৫

ত্রিশতম মজলিস

ঈদের নামাযের ঘোষণা ১৯৮
প্রকৃত অভভাবক হলেন আল্লাহ; শায়খ উসিলা মাত্র ১৯৮
ইখলাস ও খোশামোদের সঙ্গে চাওয়ার স্বাদই আলাদা ২০০
টাকার নেশা ২০১
আকাবিরের পথে দৃঢ়তার সঙ্গে অবিচল হও ২০২

পরিশিষ্ট

তাবলীগি জামাত ও দ্বীনী মাদরাসা ২০৩
সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক অমিল ২০৪
উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ (মতদ্বৈততা) ভালো; তবে মুখালাফাত (বিরোধিতা) ভালো নয় ২০৭
পরস্পরের মতদ্বৈততার ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ পথ ২০৯
আমাদের বড়গণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এক সত্তার মতো ছিলেন ২১৩
আল্লাহওয়ালাদেরকে ভয় করুন ২১৩
বড়দের অবস্থা জানার তীব্রাকাঙ্ক্ষা ২১৫
বাগানের প্রতিটি ফুলের রং-ঘ্রাণ ভিন্ন ২১৬
বড়দের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক তখনই ভালো বলা যাবে যখন ব্যক্তির মাঝেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকবে ২১৭
গুনাহের কারণে জীবনে পেরেশানি নেমে আসে ২১৭

বাচালতাই সিংহভাগ মুসিবত ডেকে আনে ২১৯
ইবরাহীম আ.-এর মত ঈমান হলে এ যুগেও সম্ভব ২২০
টাইম টেবিলের ঘটনা ২২৩
ভাগ্যের লিখন হয় না খণ্ডন ২২৪
তাকদীর ও তাদবীরের সংঘাত ২৩০
আল্লাহর পক্ষ থেকে হজের ব্যবস্থা ও বেতন না নেয়ার ঘটনা ২৩৩
রিযিক নিজেই মানুষের সন্ধ্যানে থাকে ২৩৭
মাওলানা ইউসুফ সাহেবের অমুখাপেক্ষী
বৈশিষ্ট্যের একটি ঘটনা ২৩৮
কর্নেল সাহেবের ঘটনা ২৪০
আল্লাহর দান পেতে কোনো যোগ্যতা লাগে না ২৪১
হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহের প্রভাব ২৪২
একটি বিশেষ প্রশ্ন ২৪৩
সনদের চেয়ে যোগ্যতারই বেশি প্রয়োজন ২৪৪
এক রাতে কুরআন শরীফের খতম ২৪৪
কুরআন কারীমের হিফয ২৪৫
নিজের মাশায়েখের জন্য ঈসালে সাওয়াবের বিশেষ তাগাদা ২৪৬
বুযুর্গানে দ্বীনের আত্মবিলোপের অনন্য বৈশিষ্ট্য ২৪৭
আকাবিরের দুআর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ব্যক্তির কর্মোদ্দীপনা ২৪৭
আল্লাহ যাকে দিতে চান সবকিছু ঢেলে দেন ২৪৮
রূহের চিকিৎসাই আসল চিকিৎসা ২৪৯
দুনিয়ার এই পান্থশালায় ২৫১
একটি গায়বি সাহায্য ১৫২
অভ্যাসকে ইবাদতের স্তরে ফেলা ঠিক হবে না ২৫২
নামাযের ওয়াক্তসমূহের রহস্য ২৫৩
আখেরাতের চিন্তা ২৫৭
হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর আব্বাজানের ঘটনা ২৫৮
শিষ্টাচারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ২৫৯
বাইআত কখন ছাত্রদের জন্য উপকারী ২৬০
উলামা ও শিক্ষকদের উদ্দেশে বিশেষ নসিহত ২৬০

রমাযানুল মুবারক ১৩৯১ হিজরী ২৬৩
ঈর্ষণীয় মৃত্যু ২৬৪
তাবলীগ জামাতের প্রয়োজনীয়তা ২৬৪
বাইআতের তরিকা ২৬৮

খতমে খাজেগান ২৬৯
তালিবে সাদিক অবশ্যই সফল হবে ২৬৯
শেষকথা ২৭২

প্রাককথা

الحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

রমাযানুল মুবারক হচ্ছে কুরআনে কারীমের জন্মমাস। রহমত, মাগফিরাত ও আল্লাহর তাজাল্লি বর্ষণের মাস। আনুগত্য ও ইবাদতের ভরা মৌসুম। এ মাসেই রূহানিয়াতের জোয়ার ওঠে। এ কারণেই আল্লাহর আরেফগণ, আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণ এ মাসে তাঁদের মনোস্কামনা পূরণের আশায় তপস্যায় ডুবে যান। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার সাধনায় নিমগ্ন হন। তারা সারা বছর এ এক মাসের জন্য অপেক্ষা করেন। সুদূর অতীতে যাওয়ার দরকার নেই; আমাদের খুব কাছাকাছি সময়ের অনেক বুযুর্গদের সম্পর্কে শুনেছি, তাঁরা শাওয়ালের ঈদের চাঁদ দেখতেই পরবর্তী বছরের রমাযানের অপেক্ষা শুরু করে দিতেন। রমাযানুল মুবারক আসতেই তাঁদের মধ্যে এক নতুন জোশ, আবেগ, কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে যেত। তাঁদের সেই অবস্থা-ই নিম্নের এ কবিতায় বিমূর্ত হয়েছে,

هٰذَا الَّذِىْ كَانَتِ الْاَيَّامُ تَنْتَظِرُ

فَلْيُوْفِ لِلّٰهِ أَقْوَامٌ بِمَا نَذَرُوْا

এ দিনটির জন্যই এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম,
সবাই এখন যেন আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ নিজ মান্নত পূরণ করে।

কখনো কখনো তাঁরা মনের ভাবাবেগের আতিশয্যে গুনগুনিয়ে উঠে বলতেন,

پلا ساقیا وہ مئے دل فروز　　کہ آتی نہیں فصل گل روز روز

ওহে পরিবেশনকারী! মুগ্ধতাভরা সুধা ভালো করে পান করিয়ে দাও।
কেননা ফুলেল বসন্ত প্রতিদিন তো আর আসে না।

রমাযানুল মুবারক আসতেই দ্বীনি ও রুহানী মারকাযগুলোর চিত্র বদলে যায়। খানকাহগুলোর মাঝে অন্য রকম আবহ সৃষ্টি হয়। এ সময় খানকার মাঝে দূর-দূরান্ত থেকে মধুপিয়াসী ভ্রমরের মতো দলে দলে লোক শায়খের হাতে বাইআত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছুটে আসতে শুরু করে। রুহানী সেই মারকাযগুলো তিলাওয়াত, নানামাত্রিক ইবাদক ও নফল সাধনায় এ রকমভাবে মেতে ওঠে যে, বোধ হয়- দুনিয়াতে এ ছাড়া আর কোনো কাজই নেই। মনে হয়, এটাই

শেষ রমাযান। এরপর আর কোনো রমাযান আসবে না। তখন প্রত্যেকে ইবাদতের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সাধনায় লিপ্ত হয়। রমাযানুল মুবারকের একেকটি দিনকে মনে হয়, নিজের জীবনের শেষ দিন।

আল্লাহর কোনো বান্দা যদি অল্প সময়ের জন্য এই পরিবেশে আসেন নির্ঘাত তিনি ভুলে যাবেন, দুনিয়া বলে কিছু একটা আছে। বিষন্ন মনের লোকদের মাঝে নতুন করে উঞ্চতা, কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। তপস্যার উঁচু মনোবল তৈরি হবে। এমনকি মুর্দা মনও জীবনের প্রণোদনায় জেগে ওঠবে। শৃঙ্খচূড়ায় উঠার সাহস তৈরি হবে। মনে হবে, প্রাণে প্রাণে বিজলীর তার বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সুইচে টিপ দেয়া মাত্রই তারা জেগে ওঠেছে। সেই রূহানি পরিবেশ যিনি দেখবেন তিনি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, যতদিন আল্লাহকে খোঁজার এই মিশন চালু থাকবে; দ্বীন ও আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্র করে ভ্রমরের এই প্রদক্ষিণ যতদিন অব্যাহত থাকবে; স্বার্থ ও লোভের উর্ধ্বে নিজেকে উঠিয়ে আনার এই চর্চা যত দিন চলবে; নিজের পরকাল সুসজ্জিত করার এই তপস্যা যত দিন চলমান থাকবে; ইনশাআল্লাহ এ দুনিয়া ধ্বংস হবে না। এই আয়োজন আদতে পৃথিবীর দেহে প্রাণ সঞ্চার করছে। এই মুহূর্তে আমার খাজা হাফেযের একটি চরণ মনে পড়ছে :

از صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است

عالم نشود ویراں تا میکدہ آباد است

হাজার কথার এক কথা হিসেবে ছোট্ট এ কথা স্মরণীয় যে,
যতদিন এই (আধ্যাত্মিকতার) মদশালা থাকবে পৃথিবীর বিরান হবে না।

আফসোসের বিষয় হলো, অষ্টম শতাব্দীতে সুলতানুল মাশায়েখ মাহবূবে ইলাহী হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ.-এর খানকায়ে গিয়াসপূর (দিল্লি) ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী রহ.-এর দিল্লি চিতলি কবর মহল্লায় অবস্থিত খানকায়ে মাযহারিয়্যাহ-এ রমাযানুল মুবারকের চোখে দেখা বিবরণ কোনো ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেননি। সেখানকার যিকির ও তিলাওয়াতের চিত্র, রাত্রি জাগরণ, প্রাত্যহিক কর্মসূচি কোনো বইয়ে বিশদাকারে পাওয়া যায় না। তবে فوائد الفواد، سید الأولیاء، دار المعارف প্রভৃতি গ্রন্থে যৎসামান্য ঝলক চোখে পড়ে। যারা সেই খানকাহগুলোর দিন-রাত, সেখানকার

শায়খদের অভিরুচি ও স্পৃহা সম্পর্কে অবহিত তারা এর আলোকে পরিষ্কার ইতিহাসের সেই অজানা তথ্যগুলোকে অনুমান করে নিতে পারেন। কবির ভাষায়,

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

আমার বাগান দেখে আমার বসন্তের রূপ অনুমান করে নাও।

আজ যে খানকাহগুলো ওই সকল খানকার উত্তরাধিকারীর দায়িত্ব পালন করছে, যে সকল যুগশ্রেষ্ঠ শায়খ সেই মহান পূর্বসূরীদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁরা এবং তাঁদের খানকাহগুলো আজ অতীতের সেই দৃশ্যগুলো নতুন করে জীবিত করছেন। ইতিহাসের সেই সোনালী সময়গুলোকে ফিরিয়ে এনেছেন।

গাঙ্গুহে কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর যুগে রমাদানের বসন্ত দেখেছেন; এমন লোক খুঁজে বের করা বর্তমানে খুবই দুষ্কর। তবে যারা পরবর্তীতে হযরত শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ.-এর যুগে রায়পূরে এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর যুগে থানাভবনে রমাযানের ভরা বসন্ত দেখেছেন; এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা যখন সেই বসন্তের চাক্ষুষ বিবরণ শোনান তখন হৃদয়ে গভীর দাগ কাটে।

আমার জানামতে এই সর্বশেষ যুগে যিনি আমাদের মহান পূর্বসূরীদের সেই নিশ্চিহ্নপ্রায় সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করেছেন, তাকে নতুন করে ফুলে-ফলে সাজিয়েছেন, তিনি হলেন শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.। তিনি তাঁর সবিশেষ মুরীদ ও একনিষ্ঠ অনুরক্তদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিশেষ একস্থানে অবস্থান করে রমাযানুল মুবারক অতিবাহিত করার মা'মূল শুরু করেন। সেখানে চারপাশ থেকে এমনকি দেশ-বিদেশের দূর-দূরান্ত থেকে নানা ভক্ত-অনুরক্ত একত্র হতেন। হযরত দীর্ঘ দিন সিলেটে রমাযান কাটিয়েছেন। এরপর কয়েক বছর রমাযান মাসে বাঁশকান্ডি (পশ্চিম বঙ্গ)-এ অবস্থান করেছেন। দু-এক বছর নিজ জন্মভূমি ফয়যাবাদ জেলার টান্ডা সংলগ্ন এলাহদাদপুরায় নিজের পৈত্রিক ভিটায় অতিবাহিত করেছেন। সেই স্থানগুলোতে হাজার হাজার মুরীদ, খাদেম সেসময় জড়ো হয়ে যেতেন। তারা তখন হযরতের মেহমান হতেন। সেখানে তিনি-ই তাদেরকে কুরআন শরীফ শোনাতেন। তাঁর নির্দেশনায় সবাই যিকির ও শোগল,

তিলাওয়াত ও ইবাদতে পূর্ণ একনিষ্ঠতার সঙ্গে লিপ্ত হতেন। সেখানে অবস্থানের পর সুধিমণ্ডলী নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করতেন। সেখান থেকে বয়ে আনা প্রশান্তি ও আত্মিক প্রশ্বস্তি তারা পরবর্তীতেও সুতীব্র আকারে বোধ করতেন।[১] মাওলানা আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকলে আল্লাহর ইচ্ছেয় সম্ভবত ইলাহদাদপুরায় সেই বরকতময় সিলসিলা অব্যাহত থাকত। আল্লাহ মা'লূম, তখন কত যে বান্দা সেখানে নিজের অভীষ্ট ইচ্ছে পেয়ে যেত. কত বান্দার আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির স্তরগুলো পূর্ণতা পেত, কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, মাওলানা ১৩ জুমাদাল উলা ১৩৭৭ হিজরী রোজ বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেছেন। ফলশ্রুতিতে সেই বরকতময় সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সবাই আফসোস করে বেড়াচ্ছে।

আমার মুরশিদ হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী রহ.-ও রমাযান মাসের অত্যাধিক মূল্যায়ন করতেন। ভারতভাগের পূর্বে পাঞ্জাবের ভক্তকূল—যাঁদের মাঝে প্রচুর সংখ্যক উলামায়ে কেরাম, মাদরাসার দায়িত্বশীল ও সাহেবে ইযাজত খলীফাও রয়েছেন—শাবানের শেষ দিকে রমাযান কাটানোর উদ্দেশ্যে রায়পুর চলে আসতেন। সেখানে তারা পূর্ণ মনোযোগ ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে, দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রায়পূরের সেই বিচ্ছিন্ন নিভৃত পল্লী—যেখান থেকে শহরে যাওয়ার মতো কোনো পাকা রাস্তা নেই; ধারে-কাছে কোনো রেলওয়ে স্টেশনও নেই—সেখানে তারা রমাযানের ফযীলত ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়ে যেতেন। সারা রমাযান ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকতেন। ঈদের নামায পড়ে সেখান থেকে রওয়ানা হতেন। ওই সময় রায়পূরের খানকায় কী ধরনের আবহ বিরাজ করত; শায়খ ও তালেবদের কী অবস্থা হতো, তার খানিকটা অনুমান পেতে অধমের লেখা *সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী* অধ্যয়ন করা যেতে পারে। রায়পুর ছাড়াও সাহারানপুরের ভাট হাউজ, জেল রোডস্থ সুফী আবদুল হামীদ সাহেবের কুঠি (লাহোর), ঘোড়াগলি (কোহমরি, পাকিস্তান) এবং খালেসাহজী কলেজ (লাইলপুর) প্রমুখ স্থানেও ধুমধামের সঙ্গে রমাযান অতিবাহিত হয়ে থাকে। যেখানে শত শত খাদেম ও মুতাআল্লিক্বীন জড়ো হন। যিকির, তিলাওয়াত, ইবাদত ও মুজাহাদাই হয়ে থাকে যাদের একমাত্র ব্রত।

সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা, এমনকি সেটিকে পূর্বাপেক্ষা আরও প্রসারিত

---

[১] মৌলভী আবদুল হামীদ আ'যমীর 'রিসালায়ে কিয়ামে সিলেট' পড়ে দেখুন।

ও বেগবান করার এই মহোত্তম খেদমত আঞ্জাম যিনি আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সবাই সম্যক অবহিত। যিনি নিজ হাতে আকাবির, আসলাফ, মাশায়েখ ও আসাতিযায়ে কেরামের অনেক কৃতিত্ব হেফাযত করেছেন। যিনি অসংখ্য জ্ঞানগভীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেকগুলো অপূর্ণ উদ্যোগকে সাফল্যের গোড়দোরে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি হলেন, আমাদের মাখদূম হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ.।

বিশেষকরে বর্তমানে যখন একদিকে রায়পুর ও থানাভবন নিস্প্রাণ হয়ে গেছে, অন্যদিকে হযরত মাদানী রহ.-এর ইনতিকালের কারণে তারবিয়াতের ময়দানটিতে ভীষণ শূন্যতা বিরাজ করছে। এহেন পরিপ্রেক্ষিতে মুখলিসীন ও তালেবগণ (যারা কোথাও নিজেদের আত্মশুদ্ধির তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন এবং কোথাও একনিবিষ্ট মনে রমাযান কাটানোর জন্য অস্থির হয়ে আছেন) তারা তাঁর কাছে দলে-দলে জড়ো হচ্ছেন। ১৩৮৫ হিজরী থেকে সাহারানপুরে মাদরাসায়ে মাযাহিরুল উলূমের নতুন ছাত্রাবাস সংলগ্ন বিশাল মসজিদে পুরো রমাযান মাস ইতিকাফ করার মা'মূল ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। মুতাআল্লিকীন ও তালেবগণ পঙ্গপালের মতো সেখানে ছুটছেন। প্রতি বছর সেখানে অবস্থানকারীদের সংখ্যা হু হু করে বেড়েই চলেছে।
আমি ১৩৮৮ ও ১৩৯০[২] হিজরীতে কয়েকদিনের জন্য সাহারানপুরে হাজির হয়েছিলাম। সে সুবাদে কয়েকদিন একসঙ্গে বসবাস করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে দেখেছি, শত শত মানুষ সেখানে ইতিকাফ করছেন। গড়ে প্রতিদিন তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ মানুষ অবস্থান করতেন। হিন্দুস্তান, পাকিস্তানের বাইরে হারামাইন শরীফাইন, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড থেকেও প্রচুর মুতাআল্লিকীন রমাযান কাটাতে এবং হযরতের বরকতময় সংশ্রব থেকে ফায়দা উঠাতে চলে এসেছেন। তারা সবাই শায়খের মেহমান হতেন। সেই বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন মেজাযের, বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও মাপকাঠির মেহমানদারির দায়িত্ব পালন করা এবং তাদের খেদমত করা খুবই নাজুক ও কঠিন কাজ।

বিশেষ করে এ কথা কারও অজানা নয় যে, রমাযানুল মুবারকে মানসিকতার নাজুকতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হযরতের বিশেষ খাদেমদের মধ্য হতে মাওলানা নাসীরুদ্দীন সাহেব, মাওলানা মুনাওয়ার হুসাইন সাহেব, মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ পালনপূরী সাহেবসহ আরও কয়েকজন অশেষ শুকরিয়া, দুআ

[২] ১৩৮৯ হিজরীর রমাযানুল মুবারক হযরত শায়খ মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় অতিবাহিত করেন। এ অধমও রমাযানের অর্ধেকাংশ মক্কা মুয়াযযমায় কাটানোর সৌভাগ্য পেয়েছে। সেখানকার মা'মূলাত ও নৈমিত্তিক কর্মসূচির আলোচনা আপবীতি-এর চতুর্থ ভাগে উঠে এসেছে।

ও প্রশংসার দাবিদার হবেন। তাঁরা পূর্ণ সচেতনতা ও কর্মোদ্দীপনার সঙ্গে এবং সূচারুরূপে সেই মেহমানদের আতিথেয়তা স্বার্থকভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। 'সাওয়ানেহে ইউসুফী'-এর যে অংশে হযরত শায়খের আলোচনা এসেছে, সেখানে তার খানিকটা বিবরণও উঠে এসেছে। মেহমানদের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বরকত ও তার প্রভাবের ব্যাপকতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছর—যখন আমি এ কথাগুলো লিখছি—ইতিকাফকারীদের সংখ্যা প্রায় তিনশ-তে পৌঁছেছে।[৩]

বরকতময় ওই দিনগুলোতে ইফতারি, খাবার গ্রহণ ও নফল ইবাদত থেকে ফারেগ হওয়ার পর প্রথম প্রথম এই মা'মূল ছিল যে, সকল অবস্থানকারী ও মু'তাকিফীন হযরতের কাছাকাছি চলে আসতেন। শায়খ তখন কোনো ধরা-বাঁধা নিয়মের বাইরে, কোনো ভান-ভণিতা বা কৃত্রিমতা না করে, আগত সুধীমণ্ডলীর তরবিয়ত, আত্মশুদ্ধি ও সর্বজনীন শিক্ষার জন্য কিছু নসীহত পেশ করতেন। সেখানে তিনি বুযুর্গানে দ্বীনের বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থাও শোনাতেন। যেগুলো শ্রোতামণ্ডলীর হিম্মত উঁচু করত, মনোবল মজবুত করত। তাসাওউফ ও সুলূকের কিছু সূক্ষ্মতত্ত্বও পেশ করতেন। সেই বয়ানে মাঝে কিছু কিছু ইলমী তাহকীকও উঠে আসত। এর বাইরে তিনি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য শিক্ষণীয় ঘটনাও বলতেন।[৪] কখনো-সখনো বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি, উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততার

[৩] এটি তো ইতিকাফকারীদের সংখ্যা। এর বাইরে সাধারণ অনেক মেহমানও রয়েছেন। তাদেরকে মেলালে সেটি রমাযানের শেষ দশকে প্রায় পাঁচশ ছাড়িয়ে যায়।

[৪] **রমাযানুল মুবারকের কর্মসূচি :** সাধারণত সুবহে সাদিকের দেড়-দুই ঘণ্টা পূর্বে সবাই ঘুম থেকে উঠে যেতেন। তাহাজ্জুদ ইত্যাদি থেকে ফারেগ হয়ে সেহরী খেতেন। এরপর সুবহে সাদিক পর্যন্ত নফল, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে মগ্ন হয়ে যেতেন। ফজরের নামায ওয়াক্তের শুরুতেই আদায় হতো। নামাযে পর থেকে ৯-১০ পর্যন্ত সবাই আরাম করতেন। তখন মনে হতো সেখানে গভীর রাত নেমে এসেছে। দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত মসজিদের চত্বরে কারও বয়ান বা সাইয়্যেদিনা শায়খ আবদুল কাদির জ্বিলানী রহ.-এর মাওয়ায়েয পড়ে শোনানো হতো। এরপর থেকে যোহর পর্যন্ত তিলাওয়াতের ইত্যাদির আমলে সবাই ব্যস্ত হয়ে যেতেন। যোহরের নামাযের পর খতমে খাযেগান ও দুআ হতো। যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়টিতে যিকিরের মজলিস হতো। আসরের নামাযের পর কোনো কিতাব থেকে, সাধারণত 'ইমদাদুস সুলূক, ইকমালুশ শিয়াম' পড়ে শোনানো হতো। সূর্যাস্তের ১৫ থেকে ২০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত এ পঠন অব্যাহত থাকত। এরপর সবাই দুআয় মশগুল হয়ে যেতেন। ইফতারী ও মাগরিবের নামায আদায়ের কিছুক্ষণ পর রাতের খাবার ও চা গ্রহণ করা হতো। এরপর সবাই হযরতুল আকদাস মাদ্দাযিল্লুহু যেখানে ই'তিকাফ করছেন, তার আশপাশে জড়ো হয়ে যেতেন। তখন হযরত সবার উদ্দেশ্যে বয়ান করতেন। আমাদের এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির সিংহভাগ মালফূযাত সেখান থেকেই আহরিত। অবশ্য এ বছর সেই মজলিসে হযরত শাহ ওসিয়ুল্লাহ সাহেব রহ.-এর কিতাব 'নিসবতে সূফিয়্যাহ' ইত্যাদি পড়ে শোনানো হয়। হযরত আযানের পূর্ব পর্যন্ত বয়ান চালিয়ে যেতেন। এরপর বাইআত অনুষ্ঠিত হতো। বাইআতের সময় বিরল দৃশ্যের অবতারণা হতো। যার বিবরণ সামনে আসছে। এশার নামায, তারাবীহ, বিতর ইত্যাদিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা অতিক্রান্ত

ওপরও ধর-পাকড় করতেন। মোটকথা, অবস্থার চাহিদা বিবেচনা করে যা কিছু আল্লাহ তাঁর মনে ঢেলে দিতেন, সেগুলোই তিনি পেশ করতেন। বলার সময় কোনো ধরনের ভণিতার আশ্রয় নিতেন না। তাঁর সেই মূল্যবান কথাগুলো আমরা পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে শ্রবন করতাম। অনেকের কাছে তো তাঁর কথাগুলো সঞ্জীবনা সুধার মতো মনে হতো। যত দূর মনে পড়ে, সেগুলোকে লিখে রাখার তোড়-জোড় ছিল না। হয়তো কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে, নিজের মতো করে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো টুকে রাখতেন। সেই কথাগুলো যেহেতু আল্লাহর এক বিশেষ মুখলিস বান্দার মুখ থেকে বের হতো এবং একটি বরকতময় সময়ে শান্তি সুনিবীড় পরিবেশে উচ্চারিত হতো, এ কারণে সেগুলোর উপকারিতার বরকত ফুলে-ফেঁপে স্ফীত হয়ে কয়েকগুণ বেড়ে যেত।

এ কথা জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি যে, প্রিয় মৌলভী তকিয়ুদ্দীন নদভী মাযাহেরী (১৩৮৭-৮৯ হিজরী) সেগুলোকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেছেন। একদিকে তিনি হযরতের বিশেষ ছাত্র ও মুরীদ, অন্যদিকে তিনি মেধাবী লেখক ও যোগ্য শিক্ষক। এ কারণে তিনি যা লিখেছেন, আশা করি, অবশ্যই পূর্ণ সতর্কতা ও সচেতনার সঙ্গে, বোধ ও উপলব্ধির সঙ্গে লিখেছেন। আমি এই মালফুযাত (অমীয় বাণী সংকলন) বিষয়ক গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে নজর বুলিয়েছি। সেখানে আমি পূর্বোক্ত আশাবাদগুলোর সত্যতা দেখতে পেয়েছি। আমি আশা করি, তিনি হযরতের কথার মর্মগুলো স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই সংকলগ্রন্থে যে কথাগুলো উঠে এসেছে, তা অবশ্যই প্রকাশ ও মুদ্রণযোগ্য।

আল্লাহ তাআলা হযরতের এই মুবারক সিলসিলাটিকে অব্যাহত রাখুন। অভিলিপ্সু ভাইদেরকে স্বশরীরে সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজ কানে শোনার তাওফীক দান করুন। আর যারা বিভিন্ন অপরাগতার কারণে সেখানে উপস্থিত হতে পারছেন না, তারা যেন এই সংকলনগ্রন্থের মাধ্যমে উপকৃত হতে

হতো। প্রতি এক দশকে এক খতমের মা'মূল ছিল। প্রথম দুই দশকে মৌলভী সুলাইমান খাঁন তারাবীহর নামায পড়াতেন। তিনি খুবই পরিষ্কার ও সাবলীল কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন। অবশিষ্ট এক দশকে বিভিন্ন জন কুরআন শোনাতেন। বিতরের পর সূরা ইয়াসীনের খতম ও দুআ হতো। এক-দু'বার কেউ কেউ হিফযের নিয়্যতে হযরতকে কুরআন শোনান। তখন সূরা ইয়াসীন পাঠ পরবর্তী দুআ ওই শ্রবনের পর হতো। এরপর সংক্ষিপ্ত একটি মজলিস হতো। যেখানে ফাযায়েলে রমাযান ও ফাযায়েলে দরুদ শরীফের ওপর আলোকপাত হতো। কখনো শুধু ফাযায়েলে দরুদ থেকে দরুদে মুনজিয়াত পঠিত হতো। এরপর সবাই নফল, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যেতেন। অনেক তপস্যাঅভ্যস্ত ব্যক্তি সারা রাত বিনিদ্র থেকে ইবাদত করতেন। সাধারণত রাত ১২ টার পর সবাই শোয়ার প্রস্তুতি নিতেন।

পারেন—সে দুআই করছি। তবে বাস্তবতা হলো কথা ও শব্দ দিয়ে সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির যথাযথ চিত্রায়ন করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, 'শোনা' কিছুতেই 'দেখা'-এর মতো হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সংকলককে উত্তম প্রতিদান দিন। পাঠকবর্গকে গ্রন্থটির মাধ্যমে সর্বোচ্চ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

ওয়াস সালাম
আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী
মাদরাসায়ে মাযাহিরুল উলূম
সাহারানপুরের মেহমানখানা
১৩ শাওয়াল ১৩৯১ হিজরী

শায়খের মামূলাত ও সময়সূচি

ইলমী নিমগ্নতা, মানুষের খেদমত, একাগ্রতা ও সীমাহীন ব্যস্ততার বিচারে শায়খের জীবন ছিল এ বিংশ শতাব্দীর ওইসব পূর্বসূরী আলেমদের জীবনের জীবিত স্মৃতি, যাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত, খেদমত ও ইলমী প্রচার-প্রসারের জন্য নিবেদিত ছিল। যাঁদের কার্যক্রম দেখে তাঁদের সময়ের বরকত, সাধনা, সৎসাহস এবং কেন্দ্রিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখে সবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতীত তাঁদের নিজস্ব শক্তি আর কিছু ছিল না।

ফজরের নামাযের পর কিছু সময়ের জন্য ঘরে যেতেন। প্রচুর মানুষের সঙ্গে বসে চা পান করতেন। যাদের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাটজনের কম হতো না। কোনো কোনো দিন সংখ্যা আরও বেড়ে যেত। কিছু লোকের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা হত। কিন্তু ওই সময় হযরত শায়খের কেবল চা পান করার অভ্যাস ছিল। এসময় যদি এমন কোনো দোস্ত বা গুরুত্বপূর্ণ মেহমান আসতেন, যিনি সামান্য সময়ের জন্য সাহারানপুর এসেছেন বা তার সঙ্গে কোন জরুরী আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে আসর জনশূন্য করে নেয়া হত। তিনি সেখানে তাশরীফ রাখতেন ও আলাপ-আলোচনা করতেন। তারপর নিজের ইলমী ও নিয়মিত লেখার কাজ পূর্ণ করে নিতেন। শীত-গরম, বর্ষা, নতুন কোনো ঘটনা, কোনো আন্দোলন, বড় থেকে বড় কোন মেহমানের আগমনও তাতে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারত না। কয়েকবার একথা বলেছেন, আমি হযরত রায়পুরী রহ. অথবা এ ধরনের বড় মনীষীর আগমনে লেখার কাজ বন্ধ রাখার ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু এতে মাথাব্যথা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এরপর অনুমতি নিয়ে সামান্য সময়ের জন্য লেখালেখি করে চলে আসি। অধিকাংশ সময় এ ধরনের মনীষীগণ নিজেরাই হযরত শায়খকে বিদায় দিতেন। এতে অসুবিধা মনে করতেন না। উপরতলার বসার স্থানটি লেখা-লেখির জন্য নির্ধারিত ছিল, ঘুমানোর জন্য নয়। একটা ছোট কামরা —যার মাঝে কিতাবের এত বড় ভাণ্ডার ছিল যে, মনে হত এর প্রাচীর ইত্যাদি কিতাব দ্বারাই তৈরী করা হয়েছে— ঐসব কিতাবের মাঝে সর্বসাকুল্যে একজনই বসতে পারত। যেখানে হযরত শায়খ বসতেন। তিনি যখন নিজ স্থানে পৌঁছে ওইসব কিতাবের মাঝে আশ্রয় নিতেন, তখন মনে হত

যে, কোন পাখি সারা দিন অন্য জাতির সঙ্গে ছিল, এখন সন্ধ্যাবেলায় আপন নীড়ে ফিরে এসেছে। কেউ যদি সে সময় কোন জরুরী কথা বলার জন্য আসত অথবা কোনো প্রিয় মেহমান সাক্ষাতের জন্য আসতেন, তাহলে তার বসার জন্য স্থান বের করা মুশকিল হয়ে যেত। চারদিকে ছিল কিতাবের স্তুপ, চামড়ার বিছানা, চাটাইয়ের বিছানা ও কিছু পুরানো বোতল। শায়খ এখানে রাতের সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করতেন।

হযরত ছিলেন জ্ঞানচর্চা ও আহরণের জন্য আদ্যোন্ত নিবেদিত। যার কারণে তিনি মনে-প্রাণে কামনা করতেন যে, অন্য কোনো তীব্র প্রয়োজন বা জরুরী কোনো কাজ যেন এ সময় সমস্যা সৃষ্টি না করে। ওই সময় বিশেষ মেহমান ও যিকিরকারী মুরীদদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যেন বারান্দায় বসে উচ্চস্বরে যিকির করতে থাকে। এতে শায়খের একাগ্রতার মাঝে কোনো বিঘ্ন হত না।

সাড়ে এগারোটার সময় নীচে তাশরীফ নিতেন। দস্তরখান বিছানো হত। খাবারের সময় অনেক মেহমান জমায়েত হত। সাধারণত দুই বা তিনবার খাবারের মজলিস হত। শায়খের ভাষায় একে প্রথম পিড়ি-দ্বিতীয় পিড়ি বলা হত। শায়খ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাবারে শরীক থাকতেন। নিজের খাবারের গতি এমন ছিল, যেন শেষ ব্যক্তির খাবারের সাথেও তিনি শরীক আছেন। মেহমানদেরকে বড় সম্মানের সঙ্গে আহার করাতেন। এমনকি কখনও নতুন বা অনভিজ্ঞ মেহমান বেশী খেয়ে কষ্টে পড়ে যেত। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যেত যে, শায়খ কেবলি নামমাত্র শরীক আছেন। তাঁর খাবারের পরিমাণ এত কম ছিল যে, এই পরিমাণ খাবার খেয়ে এত মেহনত করা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল; কিন্তু দস্তরখানে তিনি এমনভাবে বসা থাকতেন যে, কেউ বুঝতে পারত না যে, এমন প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী মেজবান কতটা অল্প আহার গ্রহণ করেছেন।

খাবারের পূর্বে ডাক (চিঠি) এসে যেত। এর ওপর হালকা একটু দৃষ্টি দিয়ে